'Ebong Mahua'--UGC Approved listed Journal,
Journal Serial No.--42327, Bengali Journal Serial No.--33

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal

20th Year, 110 Volume

Oct, 2018

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Midnapur

Communication :

Dr.Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

Mob.-9153177653

Email-madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor.bera @ gmail.com

Rs.500

রবীন্দ্রনাথের চোখে গ্রামোন্নয়ন

সঞ্জয় কুমার কর

বাইরের জগতের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রধানত একজন বড় কবি হিসেবে। পৃথিবীর সর্বদেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম। কবিতা, গান ছাড়া তার ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধসমূহ শুধু বাংলা সাহিত্যকে নয়, অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ও বিশ্বসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি কেবল কল্পনাবিহারী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বড়ো সহৃদয় মানুষ। একাধারে একজন যুগপ্রবর্তক চিন্তানায়ক, জ্ঞানতপস্বী শিক্ষাব্রতী ও কঠোর কর্মযোগী। তাঁর ধর্ম ছিল সবরকম ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ সংস্কারমুক্ত মানবধর্ম। তিনি নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের আনন্দময় উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমাজ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তি ছিল তার কাম্য। গ্রাম সংগঠনের মতো দুরূহ কাজের দায়িত্ব তাই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন — গ্রামে গাঁথা দুঃখী দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য। ভারতে গ্রামোন্নয়নের তিনিই পথিকৃৎ।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত সাহিত্য কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নানা সমস্যার নানা দিকে তাঁর যে চিন্তাধারা তা আশ্রমবাসী ঋষির কর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিক চিন্তা নয়— বহুক্ষেত্রে বিশেষত শিক্ষাদানে ও গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যবস্থাপনায় তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আদর্শ নিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন তাঁর থেকে আমরা বহুদূরে সরে এসেছি। কিন্তু গ্রামীন উন্নয়নে তাঁর নিজের কাজের সাফল্য বা অসাফল্য যাই হোক না কেন, তাঁর মূল চিন্তাধারা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের পরিকল্পনায় একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। আমাদের বর্তমান কালের গ্রামোন্নয়ন চিন্তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতটা ব্যাপক ও গভীর সেটা সব সময়ে আমরা অনুধাবন করি না। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখ করি অনেকটা আনুষ্ঠানিক ভাবে, কিন্তু নানা দিকে মত পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীন উন্নয়ন পরিকল্পনাতে যে সাজুয্য আছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একান্তভাবেই নাগরিক মানুষ। নগর গৃহের এবং বিদ্যালয়ের বন্দীদশায় তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পিপাসু মন হাঁফিয়ে উঠত। দূর থেকে পল্লী প্রকৃতির শোভা দেখে কাব্য রচনার সুযোগ তাঁর হয়েছে। কিন্তু গ্রামের লোকের দুঃখদৈন্য এবং বিবিধ সমস্যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, পিতার নির্দেশে জমিদারী

পরিচালনার কাজে গিয়ে উনত্রিশ বছর বয়সে। সে সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলার ঠাকুর পরিবারের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল, তার নায়েব-গোমস্তা পাইক-বরকন্দাজদের ছিল প্রজামহলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ। নগরবাসী তরুণ কবির পক্ষে সেই জমিদারী সেরেস্তার রাশি রাশি দলিল দস্তাবেজ, মোর্কদমার নথিপত্র, তহসিল ও আদায়ের মধ্যে প্রবেশ করা এবং প্রজাদের অভাব অভিযোগের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা ছিল খুবই কঠিন কাজ। আমলাদের অত্যাচার এবং অন্যায় আদায় থেকে দরিদ্র গ্রামবাসীকে রক্ষা করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। অসীম ধৈর্য এবং আন্তরিক মমতা নিয়ে তিনি ঐসব গ্রামের লোকের হৃদয় জয় করলেন। আমলাদের দাপট কমালেন, প্রতাপশালী দোষীকে শাস্তি দিয়ে, গুণী দরিদ্রকে মান্য দিয়ে, অন্যায় আদায় বন্ধ করে। সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে তার মারফত অল্প সুদে কৃষকদের ঋণ দিয়ে তিনি মহাজনদের চড়া সুদের ঋণ জাল থেকে তাদের রক্ষা করেন। ক্রমে তিনি প্রজাদের পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হয়ে দাঁড়ান।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'-কে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী এবং সরকার অনপেক্ষ হতে বলেছিলেন। গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ তার 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেছিলেন ১৯০৪-এ—অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার প্রায় এক বছর আগে।

এই প্রবন্ধটির রচনার তাৎক্ষনিক কারণ ছিল প্রদেশব্যাপী অনাবৃষ্টি ও জলকষ্ট, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ছিল ব্যাপক এবং একটি স্বয়ংক্রিয় কার্যসূচীর প্রস্তাবও এতে ছিল। জলকষ্ট নিবারণে সরকার কী কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে বিষয়ে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্বাবলম্বন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি লিখেছিলেন "সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলকর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই। গুরু গুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গভর্নমেন্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃষ্ণা নিবারণের যা হয় একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আমরা সেইজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে বসি নাই। আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জলকষ্ট ও অন্যান্য সমস্যার নিরাকরণে স্বেচ্ছাসেবামূলক স্বাবলম্বী প্রচেষ্টা। ইংরেজের আসার আগে গ্রামের অবস্থা কি ছিল তার যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাতে হয়তো আতিশয্য ছিল, কিন্তু তাতে তার প্রস্তাবিত কার্যধারার গুরুত্ব কমেনি। তিনি চেয়েছিলেন আবেদন নিবেদনের পথে না গিয়ে মফঃস্বলের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেনী পল্লী উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবেন। তাঁরা হবেন 'সমাজপতি' এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন বিভিন্ন বিষয়ের নায়ক দল। গ্রামবাসীরা অল্প পরিমাণে চাঁদা দেবেন আর বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময়ে একটি বিশেষ অনুদানও দিবেন। গ্রামের মেলাগুলিকে 'নবভাবে জাগ্রত নবপ্রাণে সজীব' করে

তুলতে হবে। সমাজপতিরা মিলিত হয়ে "কোনো প্রকার নিস্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচারণভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন।"

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাতে জমিদারদের নেতৃত্বের আশা ছিল কিন্তু জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে তখনো তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। তিনি নিজে এক বড়ো জমিদার পরিবারের সন্তান এবং জমিদারী প্রথাটার বিরুদ্ধে তিনি কখনো যান নি। জমিদার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল, তাঁরা হবেন— পিতৃপ্রতীম দয়াশীল অভিভাবকের মতো। জমিদারী পরিচালনার কাজে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

১৯২১ সালের ২২-শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অঙ্গস্বরূপ 'শান্তিনিকেতন সর্মসমিতি' এবং 'সুরুল কৃষি সমিতি' নামে দুটি পৃথক সমিতি গঠিত হয়। ১৯২৩ সালের ২৬-শে ডিসেম্বর সুরুল কৃষি সমিতির নাম বদলে শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন সমিতি করা হয়। শ্রীনিকেতন নামটির মধ্যে বদ্রীনাথের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল তা শুধু কৃষির উন্নতির মতো কোন সীমিত অর্থে নয়, পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করে গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনবার শুভপ্রয়াস।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬-ই ফেব্রুয়ারি এল্‌ম্‌হার্স্ট শান্তিনিকেতনের ন'জন যুবক ছাত্র এবং কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সুরুল গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের গোড়াপত্তন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রামের উন্নয়নের জন্য একটি কর্মতালিকা দিয়েছিলেন; গ্রামবাসীকে নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আত্মনির্ভরশীল হতে কর্মীরা সাহায্য করবেন, কুটীরশিল্পের এবং কৃষি গো-পালন করে তারা যাতে যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করতে পারে, জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে গ্রামে কূপখনন এবং মজা পুকুর পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজে সহায়তা ও উৎসাহ দান, সমবায় কোষের সাহায্যে ঋণদান করে কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্তিদান— এইসব ছিল কর্মতালিকার মধ্যে।

শ্রীনিকেতনের প্রথম ডিরেক্টর বা পরিচালক এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রত্যক্ষে সামনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে নিয়মিত অনেক পরামর্শ এবং প্রেরণা দিয়েছেন, গ্রামের যাত্রা, কথকতা, কবিগান এবং বাউলগানকে যারা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের যেন মর্যাদা দেওয়া হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেছেন। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে তিনি এইসব লোকোৎসবকে মান্য দেওয়া ছাড়া, হলকর্ষণ, উৎসবে নিজে লাঙল চালিয়ে কৃষককে সম্মান জানিয়েছেন।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার একমাস পরে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি রচনা করেছেন। তাঁর লেখা, 'আমরা চাষ করি আনন্দে' প্রভৃতি গান হলকর্ষণ উৎসবে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করে। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি তাঁর প্রবর্তিত অসাম্প্রদায়িক উৎসব বাংলার বহু গ্রামে নির্মল আনন্দ বিতরণ করছে।

গ্রামীন কুটির শিল্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই রকম মত পোষণ করতেন। কিন্তু বৃহৎ শিল্প বা আধুনিক যন্ত্রশিল্পের একেবারেই কোন প্রয়োজন

নেই— একথা রবীন্দ্রনাথ মানতেন না। ১৯২৫-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনুযোগ করেন যে রবীন্দ্রনাথ চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করেননি। উত্তরে যে প্রবন্ধটি লেখা হল তাতে তিনি বলেছিলেন যে, চাষীরাও তাদের পরিবারের লোকেরা অবসর সময়ে চরকা কাটলে উপকারই হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু চরকা কেটেই দারিদ্র দূরীকরণ এবং ইংরেজ বিতাড়ন সফলভাবে করা যাবে এ বিশ্বাস তার ছিল না। যান্ত্রিক সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না— এটা তার বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ছাড়া কোনো দেশই সমৃদ্ধ হতে পারেনি। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন বঙ্গদেশে কাপড়ের কল আর তাঁতের উৎপাদনের। এই সমস্যার মূল কোথায় তাও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

গ্রামের চাষ আর কুটির শিল্প, এই দুই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন সমবায় নীতির বিরাট সম্ভাবনা। এই নীতির রূপায়ণের পথে প্রবল যুক্তি দিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন 'ভাণ্ডার' পত্রিকাতে ১৯১৮ থেকে। কিন্তু আমাদের দেশের সমবায় ব্যবস্থায় প্রধান অংশই ছিল ঋণদান সমিতি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য ঋণদান সমিতির অবশ্য প্রয়োজন হবে, কিন্তু সমবায় ব্যবস্থায় উৎপাদনের কাজে অগ্রসর না হলে আসল কাজ কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথ একবার ডেনমার্কে গিয়ে সেখানে সমবায় উৎপাদন দেখে উৎসাহিত হন।

সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রতি তাঁর আগ্রহ অনেকখানি বেড়ে গেল ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে। তিনি দেখেছিলেন যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন করলে উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক করা যায়, উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং আর্থিক অসাম্য কমানো যায়।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসীদের শিক্ষা অর্থে পুঁথিগত কোন বিদ্যাকে গ্রহণ করেননি, তেমনি জীবনযাত্রা হতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে কোন শিক্ষাপ্রণালীকে পল্লীশিক্ষাতে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর কাছে পল্লীশিক্ষা হবে জীবনশিক্ষা বা জীবনচর্চা। পল্লীবাসীর না আছে সম্পদ, সামর্থ বা অন্নবস্ত্র— তাই তাদের এমন কিছু শিক্ষা করা উচিত যার সাহায্যে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনচাহিদার অভাব পূর্ণ করতে সমর্থ হবে। তারা যদি অন্য সব ভারতীয়দের মত পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে তথাকথিত শিক্ষিত বলে সমাজে পরিচিত হন— তবে তাদের দু'দিকই যাবে— সব চেষ্টাই হবে ব্যর্থ। পল্লীর জীবনযাত্রার পক্ষে যেসব উপায়ে প্রয়োজন তাহাই হবে 'পল্লীশিক্ষা'।

ভারতের লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মানুষের বাস যখন পল্লীগ্রামে সে স্থলে পল্লীশিক্ষা যা রবীন্দ্রনাথ পল্লীর পক্ষে একান্ত উপযোগী বলে চিন্তা করেছিলেন— তাই পল্লীশিক্ষাকে 'জাতীয় শিক্ষা' বা জাতির পক্ষে অন্যতম শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

স্বাধীন ভারতে দ্রুত গ্রামোন্নয়নের কাজ চলছে। তাতে গ্রামবাসীর সরকারী দাক্ষিণ্যের জন্য হাহাকার নিজেদের আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস কমিয়েছে। বেতনভূক কর্মচারীরা যন্ত্রের মতো কৃপা বিতরণ করছেন, যাকে যা দেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় অতীতের এই বাণী অনেকেই ভুলে গেছেন। কর্মীদের দাবির জিগির যত বাড়ছে, কাজে শৈথিল্য ততই বাড়ছে।

গ্রামসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের শুভ প্রচেষ্টা আজ বাংলার বীরভূম ছাড়িয়ে ভারতের এবং পৃথিবীর দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। স্বনির্ভরতা এবং সমবায় পদ্ধতি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়নি আজও। সরকারী কাজে নিঃস্বার্থ পল্লীদরদী কর্মীর অভাবে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। শুধু সাহিত্যে সঙ্গীতে নয়, গ্রামজীবনে কিছু সঙ্কীর্ণতা, কুরুচি, আলস্য এবং প্রবলের উৎপীড়ন তিনি কমিয়ে গেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারত সরকার শান্তিনিকেতনে কৃষি অর্থনীতির গবেষণাগার করেছেন। 'শ্রীনিকেতন' এখনো আছে। পল্লীচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সবশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন চিন্তাধারার রূপায়ণের দিকে অগ্রগতি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করেন। তাই ভারতের সর্বাঙ্গিক উন্নয়ন ও ন্যায় বিচারের পরিকল্পনাতে গ্রামোন্নয়নের স্থান সর্বাগ্রে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য— কৃষি, সেচ ব্যবস্থার ইত্যাদির উপরে— এখন কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প আছে। যেমন— ''সু-সংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি'', ''জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান কার্যসূচি'' ও ''জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থানের গ্যারান্টীর কার্যসূচি'', রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মসূচীর কথা বলেছেন। বর্তমানে জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থানের গ্যারান্টীর কার্যসূচী অনুযায়ী যে একশো দিনের কাজের প্রকল্প রয়েছে তাতে গ্রামের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়। রাস্তা তৈরি, পুকুর খনন ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ এই প্রকল্পে করা হয় সেগুলি রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই করার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গ্রামগুলি যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। গ্রামের লোকই যেন গ্রামের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন চিন্তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১. 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' — তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

২. 'রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা' — হৃষীকেশ চৌধুরী।

৩. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্দশ খণ্ড) — বিশ্বভারতী।